কলকাতা প্লেনামের লক্ষ্যে

সীতারাম ইয়েচুরি

উন্নততর ভারত গঠন করতে হলে, আমাদের জনগণের জীবনজীবিকার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে হলে আজকের সময়ে সি পি আই (এম)-র সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সংগ্রাম ব্যতীত এই লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। সি পি আই (এম)-র আসন্ন সাংগঠনিক প্লেনামে আমাদের সামনে কর্তব্য হলো এমনভাবে পার্টি সংগঠনকে গড়ে তোলা যাতে দ্রুত আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনের দিকে যেতে পারি।

সব সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের মৌলিক ভিত্তি হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী নীতিসমূহ। তার মধ্যে পড়ে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পথ অনুসরণ, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা, যৌথ কর্মপদ্ধতি ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব প্রভৃতি। কিন্তু পার্টি সংগঠন গতিশীল প্রক্রিয়া। তা শূন্যে বিরাজ করে না। সেইজন্যই কমিউনিস্টরা বলে 'রাজনৈতিক-সাংগঠনিক' কর্তব্য। সেই কারণে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে পার্টি সংগঠনের কাঠামো ও চরিত্রকে বিপ্লবী নীতির ভিত্তিতেই পার্টির এখনকার রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়।

সি পি আই (এম)-কে এই কাজ করতে হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চলে গেছে। চতুর্দশ কংগ্রেসে বিশদে আমরা এই ঘটনাবলির মূল্যায়ন করেছি। কেন এই ঘটনা ঘটলো এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এবং ভারতে এইসব ঘটনাক্রমের প্রভাব কী, তা নিয়ে আমাদের বোঝাপড়াও তৈরি করেছিলাম। তখন আমাদের কর্মী-সদস্য এবং আমাদের দরদিদের কিছু অংশকে এই বিপুল টানাপোড়েন থেকে আমরা রক্ষা করতে মূলগতভাবে সক্ষম হয়েছিলাম। তবে, তখনই আমরা উল্লেখ করেছিলাম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের আকর্ষণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এর প্রভাব অনুভূত হবে।

দু'দশক বাদে এই প্রভাব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পাশাপাশিই বিশ্ব পুঁজিবাদের বিপুল পুঁজি সঞ্চয় এবং আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির উত্থান ঘটেছে। তার ফলে বিশ্বজুড়ে নয়া উদারনীতির অভিযান শুরু হয়। নয়া উদারনীতির বস্তুগত এবং মতাদর্শগত সেই অভিযান ক্রমেই তীব্র হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়াও ভারতের তরুণ অংশের মধ্যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক অভিযান এবং পুঁজিবাদী ভোগবাদ তরুণদের এবং সমাজের বড় অংশকে বিরাজনীতিকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত।

ভারতীয় রাজনীতির দক্ষিণমুখী পরিবর্তন

ভারতের শাসক শ্রেণিগুলি, বিশেষ করে তাদের নেতা বৃহৎ বুর্জোয়ারা, নয়া উদারনীতিকে গ্রহণ করেছে। আগে ভারতের পুঁজিবাদের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে দরকষাকষি করার যে সুযোগ ছিল তা উধাও হয়ে গেছে। তাই ভারতীয় শাসকশ্রেণি কার্যত ভারতের বরাবরের জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতি পরিত্যাগ করেছে। শাসকশ্রেণি সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উদারনীতির ক্রমে সহযোগী হয়ে যাওয়ায় আমাদের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার ক্ষয় ঘটেছে, প্রগতিশীল চিন্তা ও মতাদর্শ থেকে তাদের দূরত্ব বেড়েছে।

ভারতের শাসকশ্রেণির দক্ষিণমুখী পরিবর্তন ফ্যাসিস্তসুলভ ও সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য নিয়ে আর এস এস-বি জে পি'র উত্থানের উর্বর জমি তৈরি করেছে। তারা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ও কেন্দ্রীয় সরকার দখল করা দেশে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করেছে।

স্বাধীন শক্তি বৃদ্ধি করতে, ভারতীয় জনগণের মধ্যে শ্রেণি শক্তিসমূহের পারস্পরিক ভারসাম্যের প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটাতে গেলে সি পি আই (এম)-কে এই সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও আগ্রাসনের মোকাবিলা করতেই হবে। সব স্তরেই এই কাজ করতে হবে–রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক। পার্টি সংগঠনকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থী শক্তির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যায়, ২১তম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করো

এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। সাম্প্রদায়িক ও নয়া উদারনীতির যৌথ অভিযানের বিরুদ্ধে জনগণকে সাফল্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করা আরো প্রয়োজন কেননা সি পি আই (এম)-র বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি জোট বাধছে। বিশেষ করে আমাদের শক্ত ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস ও হয়রানির রাজনীতি কায়েম করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সি পি আই (এম)-কে, দেশের সর্বত্র আমাদের পার্টিকে শক্তিশালী বামপন্থী ঘাঁটি ও ভারতের বিপ্লবী শক্তির অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিকে রক্ষার কাজে মনোযোগ দিতে হবে।

পার্টি কংগ্রেসেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম, পার্টি ও গণসংগঠনের শক্তি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, এমনকি ক্ষয় হচ্ছে; এই প্রশ্নে আমাদের ধারাবাহিক দুর্বলতা রয়েই যাচ্ছে। পার্টির গঠনে অসমতা আছে, পার্টির নির্বাচনী শক্তির গুরুতর ক্ষয় ঘটেছে। এই প্রেক্ষাপট নিয়েই পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে আমরা প্লেনামে মিলিত হচ্ছি।

দশম কংগ্রেসের পরপরই ১৯৭৮-র ডিসেম্বরে সি পি আই (এম)-র শেষ সাংগঠনিক প্লেনাম হয়েছিল সালকিয়ায়। সেই সময়ে পার্টির শক্তি বাড়ছিল, দেশে সবচেয়ে শক্তিশালী বামপন্থী ও কমিউনিস্ট শক্তি হিসাবে পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শক্তিও সমান ক্ষমতা নিয়ে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করছিল।

আজ যখন কলকাতা প্লেনামে আমরা মিলিত হচ্ছি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সেই চ্যালেঞ্জ বিশ্বজুড়েই নেই। ভারতীয় শাসকশ্রেণি নয়া উদারনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। এই সময়েই সংসদের মধ্যে ও বাইরে পার্টির শক্তি ও প্রভাব হ্রাস অথবা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা নিয়ে আমরা প্লেনামে যাচ্ছি।

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন

স্বাধীন শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ বাড়ানো ছাড়াও পার্টিকে বামপন্থী দল ও শক্তিগুলির ঐক্য জোরদার ও ব্যাপকতর করার প্রয়াস নিতে হবে। এর ফলে যে বামপন্থী ঐক্য গড়ে উঠবে তা বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যের ভরকেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে।

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সফলভাবে গড়ে তোলা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পূর্বশর্ত। সেই শ্রেণি ফ্রন্ট দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করবে।

শক্তিশালী ও কার্যকর বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন এই প্রক্রিয়ার শুরু। দশম কংগ্রেসে সি পি আই (এম) প্রথম বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথা বলেছিল শ্রেণিশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এক উদ্যোগ হিসাবে। জনগণ কেবলমাত্র দুটি বুর্জোয়া-জমিদার দল বা জোটের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন এবং বর্তমান ব্যবস্থারই কাঠামোর মধ্যে বন্দি হয়ে থাকছেন, এমন অবস্থার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যেই ওই ফ্রন্টের কথা বলা হয়েছিল।

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে কেবলমাত্র নির্বাচনী ফ্রন্ট বলে ভাবলে ভুল হবে। এটি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণিকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে লড়াইয়ের একটি সংগ্রামী জোট। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির এমন ঐক্য গড়ে তুলতে হলে শ্রমিকশ্রেণির সমস্ত অংশের সাংগঠনিক শক্তি ও সংগ্রামের অভূতপূর্ব বিকাশ দরকার। আবার তার জন্য দরকার পার্টির শক্তির বিপুল বৃদ্ধি। তা তখনই সম্ভব হবে যখন জনগণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক আরো গভীর হবে, অর্থাৎ পার্টি গণলাইন রূপায়ণ করলে। জলের মধ্যে মাছ যেমন, জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টরা তেমন।

পার্টির ২১তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক- রণকৌশলগত লাইনে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্টের কৌশলের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে পার্টির স্বাধীন শক্তি বৃদ্ধি করার ভিত্তিতেই। যুক্তফ্রন্টের বিপ্লবী কৌশলে সব সময়েই ঐক্য ও সংগ্রামের নীতির ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শাসকশ্রেণির দলগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংঘাতকে ব্যবহার করে আমাদের আশু লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের কোনো অংশের সঙ্গে ঐক্য গঠন এবং একই সঙ্গে এইসব দলেরই জনবিরোধী, শ্রমিকশ্রেণি-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। যুক্তফ্রন্টের কৌশলের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য সব সময়েই হলো এখন বুর্জোয়া দলগুলির প্রভাবে থাকা মানুষকে টেনে এনে শ্রেণিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যুক্তফ্রন্টের কৌশলের সফল রূপায়ণের দু'দিক হলো স্বাধীন গণ ও শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্রতর করা ও বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে সংঘাতকে ব্যবহার করা।

একই সঙ্গে ২১তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনে বলা হয়েছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের মোকাবিলায় সি পি আই (এম)-কে নমনীয় কৌশল নিতে হবে। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের অগ্রাধিকারকে মাথায় রেখে নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করতে হবে। পার্টি সংগঠনকে এইসব কর্তব্য পালনের উপযোগী হতে হবে।

সি পি আই (এম) সব সময়েই, বিশেষ করে চতুর্দশ কংগ্রেস থেকে নিরন্তর 'দ্বন্দ্ববাদের মূল মর্মবস্তু সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের' লেনিনবাদী নীতির ওপরে জোর দিয়েছে। চতুর্দশ কংগ্রেসের পরে দু'দশকে ভারতীয় পরিস্থিতিতে এমন সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন কী ঘটেছে, তা উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি তিনটি সমীক্ষক দল গঠন করেছিল। তারা শ্রমিকশ্রেণি, ভারতের কৃষি ও মধ্যবিত্তের ওপরে নয়া উদারনীতির ফলে কী পরিবর্তন এসেছে, কী প্রভাব পড়েছে তার সমীক্ষা করেছে। এইসব সমীক্ষার ভিত্তিতে আমাদের স্লোগান, কাজের ধারা, প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পদক্ষেপের কথা ২১তম কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন কোন কোন সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা প্লেনামে আলোচিত হবে।

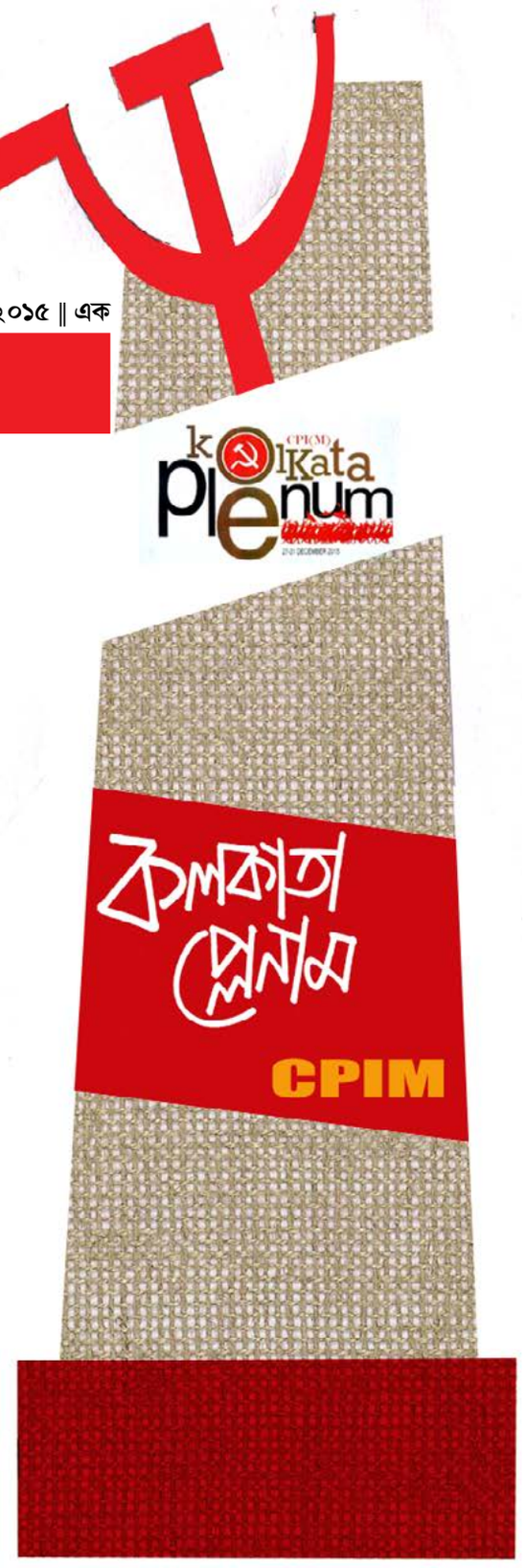

সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জকে পরাস্ত করো

বর্তমান সাম্প্রদায়িক অভিযানের মোকাবিলা করতে হবে সমস্ত মাত্রায়– রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাক্ষেত্রে। এরজন্য দরকার আমাদের সাংগঠনিক সক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি। জনপ্রিয় শৈলীতে তৈরি রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রচারের সামগ্রী তৈরি করে বিরাট আকারে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইয়ের জন্য ব্যাপক অংশের বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সমবেত করতে হবে। এইসব কাজ করতে হলে পার্টি সংগঠনকেও মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই শক্তিশালী করতে হবে।

সি পি আই (এম)-র বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি

সি পি আই (এম)-র দৃষ্টিভঙ্গি হলো আমাদের দেশের বস্তুগত সম্পদ ও মানবসম্পদকে বিকল্প নীতির মাধ্যমে উন্নততর ভারত গঠনের লক্ষ্যে ব্যবহার করা। জনগণের জন্য উন্নততর জীবনজীবিকার ব্যবস্থা করা। এখন শাসকশ্রেণি এই সম্পদকে নিজেদের সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ব্যবহার করে, এর ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সি পি আই (এম)-র দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়ণের জন্য আমাদের সাংগঠনিক সক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি প্রয়োজন। ● *দুইয়ের পাতায় দেখুন*

অঙ্কন : মনীষ দেব

পশ্চিমবাংলাকে গণতন্ত্রের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার

উপযোগী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলো

সূর্য মিশ্র

কলকাতার ত্যাগরাজ হলে ১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর তারিখে আমাদের পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ওই সপ্তম কংগ্রেসেই ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান স্তর বিশ্লেষণ করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই দেশের শাসক কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার বিশ্লেষণ অর্থাৎ বিশ্ব পরিস্থিতি ও ভারতের অবস্থার বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা সহমত হইনি। সোভিয়েত পার্টি বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলো। আর চীনের পার্টির পরামর্শ ছিলো, ভারত একটি আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ, ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণী মুৎসুদ্দি চরিত্রের এবং এখানে বিপ্লব হবে কৃষি বিপ্লব। এই উভয়বিধ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সি পি আই (এম) আমাদের দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করার অধিকার ছেড়ে দেয়নি। তারপরের ৫০বছরের ইতিহাস পার্টির এই বিশ্লেষণ ও অবস্থানকে সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। সপ্তম কংগ্রেস পরবর্তী সময়ে সাতের দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত কলকাতাতেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর ছিলো।

সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন আমাদের পার্টির নেতৃত্বের একটা বড় অংশ বিনাবিচারে আটক ছিলেন। তাই ঐ কংগ্রেসে মতাদর্শগত বিষয়গুলি নিয়ে পার্টির অবস্থান চূড়ান্ত করা সম্ভব ছিলো না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিষয়ে বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়েছিলো এই রাজ্যেই ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসের ৫থেকে ১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বর্ধমান প্লেনামে। তখনও আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন উভয় পার্টির বিশ্লেষণের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে মতাদর্শগত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম।

সি পি আই (এম)-র দ্বিতীয় প্লেনামটি হয়েছিলো হাওড়ার সালকিয়াতে এই ডিসেম্বর মাসেই, ১৯৭৮ সালে। পশ্চিমবঙ্গে আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস ও সারা দেশে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করে পার্টির মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা এবং কেরলে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও তার প্রভাব বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সালকিয়া প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সারা দেশে পার্টির মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সারা দেশে পার্টি সংগঠনের প্রসারের লক্ষ্যে সঠিকভাবে গণবিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার আহবান জানানো হয় এই প্লেনাম থেকে।

এখন একটা সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টির তৃতীয় প্লেনামটি অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদের রাজ্যের ওপরে অর্পিত হয়েছে। আগামী ২৭শে ডিসেম্বর ব্রিগেড সমাবেশের মধ্য দিয়ে এই প্লেনামের শুরু, চলবে এবছরের শেষ দিন পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, সালকিয়া প্লেনামের মতো কলকাতা প্লেনামও একটি সাংগঠনিক প্লেনাম। এখানে সংগঠন সংগ্রাম সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া রিপোর্ট ও প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক, আলোচনা, সংশোধন ও সংযোজনগুলির ভিত্তিতে চূড়ান্ত হবে।

সালকিয়া প্লেনাম থেকে কলকাতা প্লেনাম, মাঝখানের ৩৭বছরে দুনিয়া দেশ ও রাজ্যের পরিস্থিতিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সাময়িকভাবে হলেও বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে চলে যায়। লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়ন ও নয়া উদারবাদী অর্থনীতির দাপট সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও আধিপত্য বিস্তার করেছে। সংঘ পরিবার পরিচালিত বি জে পি-র হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির উত্থান এই সময়ে বেড়েছে, এখন যা লোকসভায় এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছে।

রাজ্যে একটা স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আক্রান্ত গণতন্ত্র, মেহনতি মানুষের জীবন জীবিকা ও পশ্চিমবঙ্গের সুমহান সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোনো একটি আক্রান্ত হলে অপরটিও আক্রান্ত হয়। রাজ্যের ও কেন্দ্রের সরকার এই উভয়বিধ আক্রমণের উৎস। এদের আপাত পরস্পর বিরোধী অবস্থানের আড়ালে রয়েছে এদের মধ্যেকার মেলবন্ধনের প্রকৃত রূপ। দুই সরকার, দুই শাসকদলই অসহিষ্ণু, গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও জনগণের রুটি রুজির ওপরে আক্রমণ ও দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। এই সরকারের সংবিধান সম্মত আয়ুষ্কাল পূর্ণ হতে আরো দেড়শো দিন বাকি। ইতিমধ্যে আরও ৫বছরের মেয়াদের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে লিজ নিতে তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে রাজ্যের শাসকদল। মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই আকাশপথে বিচরণ করছেন। মাটিতে নামলেই প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। অথচ চা বাগানে অনাহারে মৃত্যু অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ২টাকা কেজি দরে চালগমের প্রতিশ্রুতি সেখানকার চা বাগানের কান্না চাপা দিতে পারছে না। চা, চট, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন শিল্পে ইতিমধ্যেই ৫০হাজারের বেশি শ্রমিকের কাজ নেই। কারণ একের পর এক কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে যে শিল্পপতির বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা সর্বাধিক, তিনি নাকি এখান থেকে পুঁজি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আফ্রিকায় জঙ্গল কেনার জন্য। নয়াচরে ১৩হাজার একর জমিতে এখনো কিছুই হলো না, তার জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। এখন কার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন? নন্দীগ্রামে মানুষের জন্য আরেকটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি কিংবা ৫৮টি শিলান্যাস ইত্যাদির স্রোত বইছে। ব্যস্, নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য সরকারের করণীয় শেষ!

কৃষকের ধান, পাট, তামাক, আলু কেনার লোক নেই। বন্যার বছরেও রবি বোরো চাষের জল নেই। গ্রামের খেতমজুর ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের কাজ নেই। অন্য রাজ্যে পাড়ি দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে বহুগুণ। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস-বাইরে যেতে হবে না কাজের খোঁজে। কাজ নেই তো মুড়ি ভাজ। তিনি বলেছেন, চিন্তা নেই, ৬টি নতুন জেলা হবে। যদিও তিন বছর আগে সর্বদলীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিতে যা স্থির হয়েছিলো (কালিম্পং বাদে) সেগুলি

● *দুইয়ের পাতায় দেখুন*

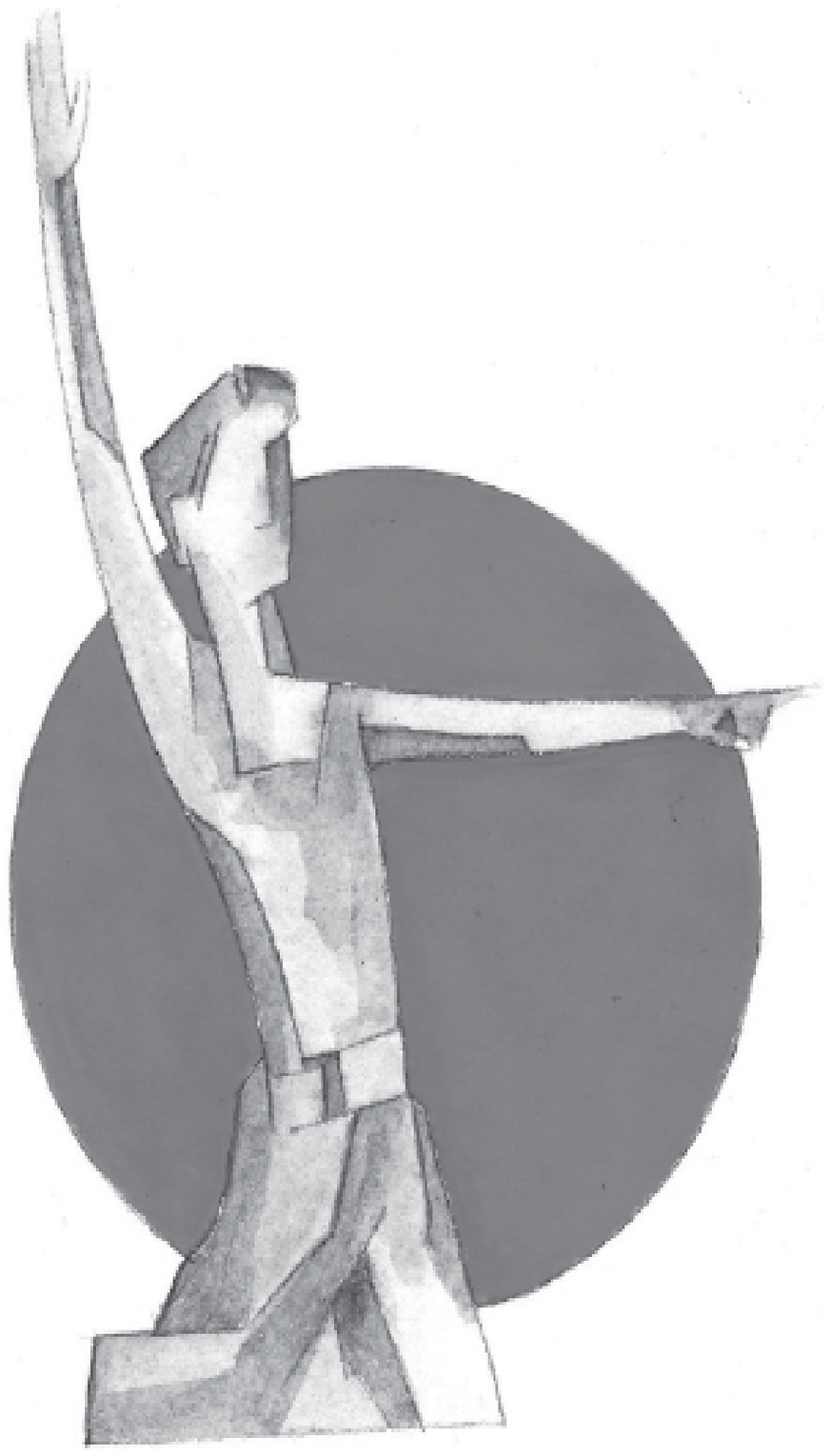

উপযোগী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলো

● *একের পাতার পর*

হতে আরো একবছর লাগবে। আলিপুরদুয়ার নতুন জেলা হয়েছে। কিন্তু এখনো জেলার পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হলো না। বিধানসভার অধিবেশন শেষ হওয়ার পরের দিন মন্ত্রিসভার বৈঠক করে সব সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাছে বিধানসভায় কোনো প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, তফসিলি জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর মানুষদের জন্য নাকি ১০০ শতাংশের বেশি কাজ হয়ে গেছে। বাস্তবে সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ টাকার অর্ধেকও খরচ হচ্ছে না। উন্নয়ন দূরের কথা, বামফ্রন্ট সরকারের অর্জিত সাফল্যগুলিও এখন বিশ বাঁও জলে চলে যাচ্ছে।

পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষণের ঘটনার প্রধান আসামী এখনো অধরা। কারণ তিনি নাকি শাসকদলের নিরাপদ আশ্রয়ে। কাটোয়ার ধর্ষণের অপরাধীরা প্রমাণের অভাবে ছাড়া পায়। ধূপগুড়ির কিশোরী ধর্ষণ ও খুনের মামলায় বিচার শুরু হওয়ার আগে তার বাবা ও মামাকে গ্রেপ্তার করা হয় ঘটনার একমাত্র সাক্ষীকে খুনের অভিযোগে। যখন কাকদ্বীপ থেকে কামদুনি মিছিল হচ্ছে, তখন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে তিন ছাত্রী দুষ্কৃতীদের দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার। একজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সর্বত্রই শাসকদল এমনকি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ঘটনাগুলি ধামাচাপা দিতে ও অপরাধীদের আড়াল করতে প্রকাশ্যে কোমড় বেঁধে নেমেছেন। সবংয়ে ছাত্র খুন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত তৃণমূল গুন্ডাদের হাতে পিস্তল, বোলপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র খুন, প্রতিদিন ঘটনা ঘটেই চলেছে। তৃণমূলের এক বিধায়ক তৃণমূলের আরেক বিধায়ককে স্বাস্থ্য অধিকর্তা বলে কিছু সুপারিশ সংবলিত চিঠি লিখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাঁকে স্বাস্থ্যভবনে যেতে বারণ করেছেন। কিন্তু যে চেয়ার বা পদ ব্যবহার করে টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ সেই মেডিক্যাল কাউন্সিলের অফিস থেকে সরে যেতে বলেননি। রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্যের হাল এখন তাঁরই হাতে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দলের কেউ চুরি করলে দল চোর হয়ে যায় না। কিন্তু চোরেদের যে একটা দল হতে পারে সেটা কি স্বঘোষিত 'গুন্ডা কন্ট্রোলার' অস্বীকার করতে পারেন? এই সেদিনও ওঁর মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্যকে উনি ক্লিনচিট দিলেন। দুদিন পরেই আদালত সি বি আই-কে জেলে গিয়ে তাঁকে জেরা করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। সারদা মামলায় এক চিত্রকরের মুম্বাইয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ ঐ চিত্রকরের সম্পত্তির মূল্য নাকি মাত্র ১০০ কোটি টাকার! তাহলে প্রশ্ন ওঠে, যার একেকটা ছবি এক কোটি টাকারও বেশি দামে বিক্রি হয় তাঁর সম্পত্তি কোথায় কোথায় গচ্ছিত আছে এবং তার দামই বা কত? প্রতারিত আমানতকারীরা কবে টাকা ফেরত পাবেন? ত্রিফলা, এস জে ডি এ, টেট ইত্যাদি কেলেঙ্কারির নায়ক নায়িকাদের বিচার কবে হবে? আসলে এই সরকার থাকতে থাকতে এই সব কোনো প্রশ্নেরই সমাধান সম্ভব নয়। সমাধানের একটাই পথ- এই সরকারকে উচ্ছেদ করা।

কিন্তু কেবল তৃণমূল সরকারের নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে সমালোচনাই যথেষ্ট নয়। ইতিবাচক হস্তক্ষেপই বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান চাহিদা। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের পাশাপাশি তৃণমূলের ৫বছরের অভিজ্ঞতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা, বামফ্রন্টের সাফল্যগুলি সংহত করে ভুলত্রুটিগুলি সংশোধন করে আগামী দিনে একটি ইতিবাচক কর্মসূচি রূপায়ণের সংগ্রামে রাজ্যের জনগণকে সমবেত করার মধ্য দিয়েই পরিস্থিতির চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। গত ৫বছর ধরে যে সমস্ত দাবির ভিত্তিতে রাজ্যে গণসংগ্রামগুলি সংগঠিত হয়েছে সেগুলিই হবে আমাদের নির্বাচনী সংগ্রামের ইশ্‌তেহার।

এই বিকল্পের জন্য সংগ্রামে রাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে সমবেত করার দায়িত্ব সি পি আই (এম)-সহ বামপন্থীদেরই নিতে হবে। প্রশ্ন ওঠে, এই শক্তিগুলি বলতে ঠিক কী বোঝায়? এখন তাদের অবস্থান কোথায়? সন্দেহ নেই কংগ্রেস তৃণমূল বি জে পি-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাধারণ অনুগামী, বিভিন্ন গণসংগঠন ও সামাজিক সংগঠন, নাগরিক সমাজ তথা দলীয় রাজনীতি করেন না, এমন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গকে একটি সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি মঞ্চে সমবেত করা সম্ভব। অবশ্যই এই সাধারণ কর্মসূচির ন্যূনতম ভিত্তি হতে হবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জনগণের জীবন জীবিকার ওপরে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির আক্রমণ, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির মোকাবিলা করা। এই প্রশ্নগুলিতে যারা অর্থ ও পেশিবলের কাছে আত্মসমর্পণ না করে এই সংগ্রামে জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন তাঁদের কী করে একটি সাধারণ যুক্তফ্রন্টে সমবেত করা যায় সেটাই হলো এই সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ। রাজ্যে তৃণমূল সরকারকে অপসারিত করে এটাই কেবলমাত্র একটি বিকল্প সরকার গঠনের ভিত্তি হতে পারে।

কলকাতা প্লেনামের অব্যবহিত পরেই নতুন বছরের শুরু থেকে রাজ্যের শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলিকে স্বৈরতান্ত্রিক তৃণমূলের এই অপশাসনের অবসানের লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে উন্নীত করতে হবে। নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির জটিলতাগুলির মোকাবিলা করে সম্ভাবনাময় উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে পার্টিকে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রামের রণকৌশল স্থির করতে হবে। ২৭শে ডিসেম্বরের ব্রিগেড সমাবেশের মূল রণধ্বনি 'তৃণমূল হঠাও বাংলা বাঁচাও-বি জে পি হঠাও দেশ বাঁচাও'-কে বাস্তবায়িত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিকল্প গড়ে তোলাই হবে এই রণকৌশলের প্রধান উপাদান। পশ্চিমবাংলাকে গণতন্ত্রের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেই দেশব্যাপী 'বি জে পি হঠাও, দেশ বাঁচাও' স্লোগানকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। এই সংগ্রামের উপযোগী একটি বিপ্লবী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলাই কলকাতা প্লেনামের মূল লক্ষ্য।

সালকিয়া প্লেনাম পার্টির প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলো, পার্টি প্রসারিত হয়েছিলো। কিন্তু অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে এই প্রসারকে পরবর্তীকালে সংহত করা যায়নি। পার্টির গণভিত্তিকে সারা দেশে প্রসারিত করার উপযোগী মতাদর্শগত রাজনৈতিক বিচারে বলীয়ান একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার বস্তুগত উপাদান বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ক্রমবর্ধমান আক্রমণগুলির মোকাবিলায় ব্যাপকতম প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও প্রত্যাঘাত হানার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি বুথ, প্রত্যেকটি পাড়া, প্রত্যেক বাড়ি ও প্রত্যেকটি মানুষের কাছে এই বার্তা নিয়ে যেতে হবে। শেষ বিচারে জনগণই ইতিহাস রচনা করেন। এটা এমন এক সময় যখন অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তাঁরা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারেন। সেই মানুষের ওপরে আস্থা রাখতে হবে। তাঁদের আস্থা অর্জন করতে হবে।

পার্টির সর্বোচ্চ নেতাদের সাদামাটা জীবনযাপন সাড়া জাগিয়েছিল মানুষের মনে

শঙ্কর ঘোষাল

পার্টির সাধারণ সম্পাদক কিনা সকালবেলা পায়ে হেঁটেই দেড় কিলোমিটার দূরে টাউন হলে সবার আগে এসে হাজির হয়ে যাচ্ছেন! শুধু তাই নয়, রাতের বেলা সমস্ত প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবকরা শুয়েছেন কিনা তার তদারকি করে বেমালুম ডাইনিং টেবিলে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ছেন! পার্টির সভা হচ্ছে, আর তাকে ঘিরে মানুষের কী উৎসাহ, উদ্দীপনা! শহরের মিষ্টান্ন বিক্রেতারা সীতাভোগ, মিহিদানা এবং শক্তিগড়ের ল্যাংচা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন। চাল, সবজি, মাছ দিয়ে সাহায্য করছেন গ্রামের কৃষক, মৎস্যজীবী বন্ধুরা। স্মৃতির পাতায় বর্ধমান প্লেনাম।

১৯৬৮ সালের ৫-১২ ই এপ্রিল বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয় মতাদর্শগত প্রশ্নে সি পি আই (এম)-র কেন্দ্রীয় প্লেনাম। যে প্লেনামের দলিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ১৯৭৮ সালে সালকিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পার্টির সংগঠন সম্পর্কিত প্লেনাম। সংগঠন নিয়ে আবার প্লেনাম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতায়, আগামী ২৭-৩১শে ডিসেম্বর। কলকাতা প্লেনামের ঠিক আগে হাজির হয়েছিলাম প্রায় পাঁচ দশক আগে বর্ধমান প্লেনামের সময় যাঁরা সেই সময় বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁদের কাছে। কারণ প্লেনামে প্রতিনিধি যাঁরা ছিলেন, সেই পুরানো নেতৃত্বের অধিকাংশই আজ আমাদের মধ্যে নেই। আবার তখন স্বেচ্ছাসেবক যাঁরা ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বে উঠে এসেছেন। বর্ধমানে পার্টির এই শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা শুনে প্রথম অনুভূতিতেই তাঁদের মনে হয়েছিল, সর্বভারতীয় একটি পার্টি, তার প্লেনাম হচ্ছে কিনা বর্ধমানের মতো একটি জেলায়! নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে একটা মর্যাদাবোধও জন্মেছিল, কত বড় সাংগঠনিক দক্ষতা, লড়াই-সংগ্রামের ঐতিহ্য থাকলে এত বড় মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়! সেই গুরুদায়িত্ব যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করার জন্যই পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনেরও দায়িত্ব পেয়েছিল বর্ধমান। জেলার বড়শুলে সেই কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমানে কেন্দ্রীয় প্লেনামে যেখানে পলিট ব্যুরো সদস্যরা ছিলেন সেই বর্ধমান ভবনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বর্তমানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য নিরুপম সেন। তিনি কথায় কথায় স্মৃতি থেকে তুলে আনলেন সেই সময়ের কথা। বললেন, সেই সময় বর্ধমান ভবন থেকে টাউন হল যেখানে অধিবেশন হয়েছিল, সেই প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড পি সুন্দরাইয়া পায়ে হেঁটেই চলে আসতেন। কাঁধে থাকতো বড় একটি ব্যাগ, তাতে সব বইপত্র থাকতো। তখন গাড়ি কম ছিল, যদিও সাধারণ সম্পাদকের জন্য তাঁর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু উনি অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটেই টাউন হলে অধিবেশনে যোগ দিতেন, এতে আমরা অস্বস্তিবোধ করতাম। আমরা তাঁর কাঁধ থেকে ব্যাগ নিতে চেষ্টা করলেও কিছুতেই দিতেন না। সেই সময় বর্ধমান ভবনে ঘর কম ছিল, যে ডাইনিং টেবিলটি অফিসের কাজে সারাদিন ব্যবহার হতো, আমরা দেখতাম রাতে তিনি সেই টেবিলেই একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়তেন। আমরা তখন বাইরে বারান্দায় রাতে শুতাম। কমরেড সুন্দরাইয়া রাতে এসে দেখতেন আমরা ঘুমিয়েছি কিনা, তারপর তিনি শুতে যেতেন। সেই সময় পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এইরকম সাদামাটা জীবন-যাপন দেখে আমরা খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

প্লেনামকে সামনে রেখে যে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, নিরুপম সেনের স্মৃতিচারণায় উঠে এলো সেকথাও। তিনি বললেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণসংগ্রহ, প্লেনামের কথা এলাকার প্রতিটি পরিবারের কাছে নিয়ে যাওয়া ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্ধমানে এই প্লেনামকে সফল করা যে শহরের মানুষের মর্যাদার প্রশ্ন, এই বিষয়টিকে সামনে রেখে প্রচার-প্রস্তুতি ছিল চরমে। সেই সময় ডাঃ কিরীটি দত্ত, অশ্বিনী হাজরা, চন্দ্রশেখর চ্যাটার্জি, মুকুন্দমাধব সামন্তর মতো শহরের বহু বিশিষ্ট মানুষ প্লেনামকে সফল করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সি এম এস

প্লেনামের একফাঁকে আলোচনা সেরে নিচ্ছেন পি সুন্দরাইয়া, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত। রয়েছেন বিনয় চৌধুরি। বর্ধমান টাউন হলে তোলা ছবি। এপ্রিল ১৯৬৮।

আই স্কুলে প্রতিনিধিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই স্কুলে বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিও ছিলেন। বেশিরভাগ পলিট ব্যুরো সদস্য ছিলেন বর্ধমান ভবনে। প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু ছিলেন বর্ধমান শহরের বড়বাজারে কালোদার বাড়িতে। সম্ভবত কাকাবাবু ছিলেন আকবরদার বাড়িতে। সেই সময় সাইকেলই ছিল আমাদের প্রধান যান। সেই সাইকেল নিয়ে পত্রিকা বিক্রি করতাম আমি, মদনদা। পোস্টার মারতেও সাইকেল ব্যবহার হতো। তখন গোটা শহরজুড়ে পার্টি ছিল না, তাই ভুষোকালি আর পোড়া মোবিল নিয়ে দেওয়াল লিখতে কখনো বাজে প্রতাপপুর, আবার কখনো বিবেকানন্দ কলেজ মোড় এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় যেতে হতো।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষও ছিলেন বর্ধমান প্লেনামের একজন স্বেচ্ছাসেবক। স্মৃতির পাতা থেকে সেদিনের কথা তুলে এনে বললেন, বর্ধমানে যখন পার্টির কেন্দ্রীয় প্লেনাম হয় তখন আমি ছিলাম ছাত্র। আমারও দায়িত্ব পড়েছিল স্বেচ্ছাসেবকের। সেই সময় বর্ধমান প্লেনামকে কেন্দ্র করে চমৎকার সাজানো হয়েছিল শহরকে। হাতে লেখা পোস্টার, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন দিয়ে সেজে উঠেছিল গোটা শহর। টাউন হলের সামনে তৈরি হয়েছিল তোরণ। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চড়েই বেশির ভাগ প্রচার করতে হতো। প্লেনামকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা বিষয়ে সেমিনার হয়েছিল। সেই সেমিনারে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই সময়ের জেলার নেতৃবৃন্দ ছাড়াও রাজ্য নেতৃত্ব।

বর্ধমান জেলার প্রবীণ পার্টিনেতা, প্রাক্তন সাংসদ নিখিলানন্দ সরও স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর বাড়ি মঙ্গলকোটে হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এই প্লেনামের কারণে এক মাসের জন্য বর্ধমানে আনা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, সেই সময় জেলায় পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন সুবোধ চৌধুরী, বিনয় চৌধুরি, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিজয় পাল। তাছাড়া হরেকৃষ্ণ কোঙার, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল রাজ্য কেন্দ্রে কাজ করলেও বর্ধমানে দায়িত্ব পালন করতেন। প্লেনামে প্রতিনিধি ছিলেন পার্টির প্রবীণ নেতা বিনয় কোঙারও। সেই সময় কমরেড সর্ববিজয় হাজরার বাড়িতে পোস্টার লেখা হতো দিনের বেলা। পরে সন্ধ্যার পর সেই হাতে লেখা পোস্টার দেওয়ালে মারতে যেতেন পার্টিকর্মীরা। যতদূর মনে পড়ে, সেই সময় প্লেনাম সফল করতে রেলকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের বাড়িতে, স্কুলে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্লেনামকে কেন্দ্র করে সেই সময় রান্নাঘরের দায়িত্বে ছিলেন সুবোধদা, কালোদা, অশ্বিনী হাজরা, সন্তোষ খাঁ-রা। তখন আমাদের পার্টির জেলা অফিস ছিল মোবারক বিল্ডিং। প্রতি রাতে আমরা ক্যাম্পে ক্যাম্পে খাবার পৌঁছে দিতাম প্রতিনিধিদের কাছে। সেই সময় রানিগঞ্জের বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, যাঁরা প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। প্লেনামের প্রতিনিধিদের চিকিৎসার ব্যাপারে ডাঃ সৌরেন মুখার্জি, ডাঃ এস কে নিয়োগীসহ অনেকেই সাহায্য করেছিলেন।

তবে বর্ধমান প্লেনামকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে যে প্রকাশ্য সমাবেশ হয়েছিল তা এখনও অনেকেরই স্মরণে আছে। মাঠভরে রাস্তায় মানুষ থই থই করা সেই সমাবেশে পি সুন্দরাইয়া, পি রামমূর্তিসহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্যের চমৎকার ভাষান্তর করেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। সেই সমাবেশের কথা বলতে গিয়ে রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়লেন অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য। তিনিও সেই সময় প্লেনামে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বললেন, হরেকৃষ্ণ কোঙারের সেই প্রাণবন্ত অনুবাদ আজও যেন কানে বাজছে। বিষয়বস্তু থেকে সরে না গিয়ে যেন নতুন করে সৃষ্টি করছেন। সলিল ভট্টাচার্য জানালেন, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্প হয়েছিল সি এম এস আই স্কুলে। কমরেড রবীন সেন স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং দিয়েছিলেন। প্লেনামের সময় স্বেচ্ছাসেবকরা লাল টুপি পরে গার্ড অফ অনার দিয়েছিলেন প্রতিনিধিদের। সুন্দরাইয়া সেই গার্ড অফ অনার নিচ্ছেন এই ছবিও তুলেছিলাম আমরা। ছবি তুলেছিলেন তখন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার চিত্রসাংবাদিক মলয় ঘোষও। প্লেনামকে সামনে রেখে প্রদর্শনীও হয়েছিল টাউন হলে।

সলিল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, প্লেনামকে সামনে রেখে বর্ধমান শহরে ভাল সাড়া পড়েছিল। মনে আছে শহরের মিষ্টান্ন বিক্রেতারা সীতাভোগ, মিহিদানা এবং শক্তিগড়ের ল্যাংচা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করেছিলেন। এছাড়াও সেই সময় চাল, সবজি, মাছ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন গ্রামের কৃষক, মৎস্যজীবী বন্ধুরা। দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিনিধিদের জন্য সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারও তৈরি হয়েছিল। সেই সময় সুবোধদা, বিনয়দা, শাহেদুল্লাহ সাহেব, সুশীলদা, কালোদা, বিজয়দা এঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন প্লেনাম সফল করে তুলতে।

কাকাবাবু ও 'নবরত্ন'। ১৯৬৮ সালে বর্ধমান প্লেনামে সি পি আই (এম)-র প্রথম পলিট ব্যুরোর নয়জন সদস্যের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। (বাঁদিক থেকে) রয়েছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, এ কে গোপালন, পি রামমূর্তি, কাকাবাবু, এম বাসবপুন্নাইয়া, হরকিষাণ সিং সুরজিৎ, পি সুন্দরাইয়া, বি টি রণদিভে, জ্যোতি বসু ও ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ।

কলকাতা প্লেনামের লক্ষ্যে

● *একের পাতার পর*

সি পি আই (এম)-ই একমাত্র এই বিরাট কাজ সম্পন্ন করতে পারে। পার্টি সংগঠনকে সুবিন্যস্ত করে, শক্তিশালী করে নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে দাঁড়াতে হবে সি পি আই (এম)-কে। আজকের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এ কাজ আরো জরুরি কেননা বি জে পি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে ভারতীয় শাসকশ্রেণির নীতি অভিমুখে নয়া উদারনীতি ও ভয়ংকর সাম্প্রদায়িকতা মিশে যাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার সংগ্রাম ও পরবর্তী সময়ে জনগণের আন্দোলনে সি পি আই (এম)-র লড়াইয়ের ঐতিহ্য আমাদের নিজেদের পুনরায় স্মরণ করাতে হবে। আমাদের কমরেডদের গৌরবময় আত্মত্যাগ, আমাদের বীর শহীদদের দীর্ঘ তালিকা, সমস্ত মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী কমিউনিস্ট শক্তি হিসাবে আমাদের গড়ে ওঠা এই ঐতিহ্যের অংশ। শোষক শ্রেণিগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের শোষিত শ্রেণির বিপুল পরিমাণ জনগণ বিদ্রোহে শামিল না হলে কোনো সামাজিক রূপান্তরই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়, বস্তুত কল্পনাও করা সম্ভব নয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণই ইতিহাসের নির্মাতা। বিপ্লবের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়। বিপ্লবী পার্টি সি পি আই (এম) জনগণের উত্থানের অগ্রগামী বাহিনী। এ আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কলকাতা প্লেনামে এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞাকে আরো দৃঢ় করার শপথ নিতে হবে।

গণলাইন অনুসরণ করা বিপ্লবী পার্টি সি পি আই (এম)-কে শক্তিশালী করো।

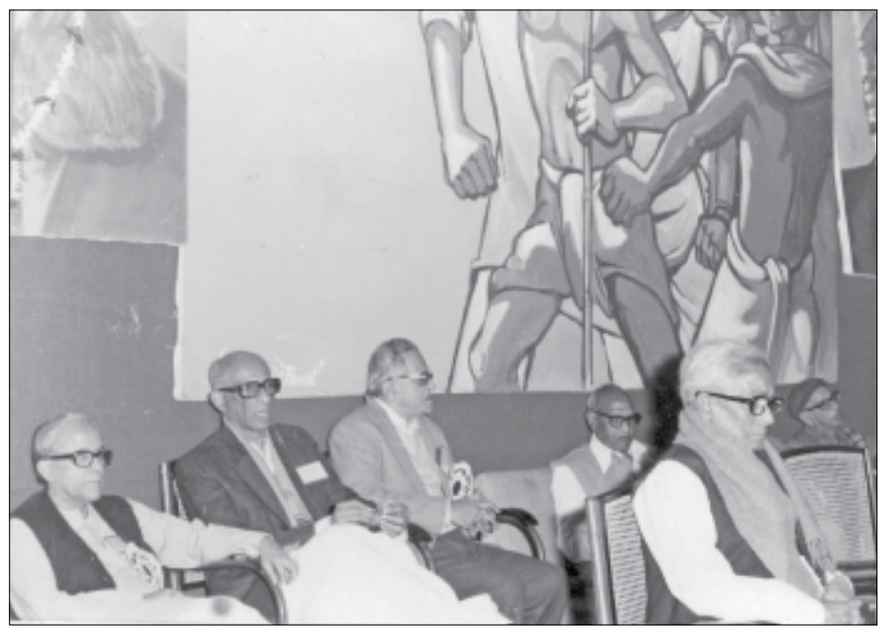

সালকিয়া প্লেনামে প্রতিনিধি অধিবেশনে জ্যোতি বসু, এম বাসবপুন্নাইয়া, বি টি রণদিভে, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, প্রমোদ দাশগুপ্তসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সালকিয়া প্লেনামে স্বাগত

জ্যোতি বসু

প্রিয় কমরেড প্রতিনিধিবৃন্দ,

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে গুরুত্বপূর্ণ এই কনভেনশনে অংশ নিতে যাঁরা সমবেত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের পার্টি তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছে।

এই কনভেনশনের আয়োজন করার এবং প্রতিনিধিদের আতিথ্য দেওয়ার দায়িত্ব পাওয়া আমাদের কাছে বিরাট সম্মানের ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গে এক বিরাট বিপর্যয়ের পশ্চাদপটে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। অভূতপূর্ব বন্যা ও বৃষ্টির পরিণতিতেই এই বিপর্যয়। গত একশতকে এরকম বিপর্যয় ঘটেনি। বিপর্যয়ে নিহতদের জন্য আমরা বেদনা প্রকাশ করছি এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চলে মানুষকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদের যে দশজন তরুণ প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

এই কনভেনশন উপলক্ষে আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করছি এগারোশো কমরেড ও বন্ধুকে। কংগ্রেস জমানা আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন। আমরা গর্বিত হই একথা ভেবে যে, গত ছ'বছরের কঠোর পরীক্ষা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তি এবং স্বৈরতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদনের শপথ আমরা পুনর্বার ঘোষণা করছি।

বিপর্যয়কর বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে এই কনভেনশন করার ব্যাপারে পলিট ব্যুরো স্বভাবতই দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু পার্টির রাজ্য কমিটি, বিশেষত হাওড়া জেলা কমিটি ও হাওড়ার কমরেডরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই এই কনভেনশন করার দায়িত্ব নিলেন। একই সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হলো যাতে হাওড়া ও অন্যান্য জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এই সিদ্ধান্ত হাওড়ার মানুষও আন্তরিকতা ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাগত জানান। কনভেনশনের প্রস্তুতিকার্যে ব্যাপক সমর্থন ও উৎসাহ থেকেই এটা পরিষ্কার।

এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, হাওড়া জেলার জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ। ব্রিটিশ আমল থেকেই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বঙ্গভাষাভাষী শ্রমিক শ্রেণিভুক্ত অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই অ-বাঙালি।

শ্রমিকদের মধ্যে সি আই টি ইউ দ্রুত প্রভাববিস্তার করেছে। সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলেও পার্টির প্রভাব যথেষ্ট। গ্রামবাসীদের একটা বিরাট অংশও শ্রমিকশ্রেণির অংশে পরিণত হয়েছে।

এই প্লেনামে পার্টির পরীক্ষিত নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালনে। যে দায়িত্ব দশম পার্টি কংগ্রেস অর্পণ করেছিল। দশম কংগ্রেস যে রাজনৈতিক রণনীতিগত লাইন নির্ধারিত করেছে তার রূপায়ণে সংগঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন। পার্টি সংগঠনের সমস্যা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে। পার্টি সংগঠনের শক্তি ও দুর্বলতা আমরা বুঝবো। এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবো। কেন্দ্রীয় কমিটি যে দলিল প্রচার করেছিল তার উপর রাজ্য কমিটিগুলি তাদের সুবিবেচনাপ্রসূত মতামত পাঠিয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় কমিটির পুনঃখসড়াকৃত দলিলের উপর প্রতিনিধিদের আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আলোচনার সময় আমরা অবশ্যই স্মরণে রাখবো যে দশম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে।

''কয়েক হাজার সদস্যের একটি দুর্বল ও অবিন্যস্ত পার্টি নিয়ে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব পালন করা যায় না। পার্টিকে অবশ্যই জনগণের মধ্যে গভীরে মূল প্রোথিত করতে হবে এবং প্রতি বছর কয়েক হাজার করে অনুগামীকে অর্জন করতে হবে।'' প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে : ''মার্কসবাদ লেনিনবাদের মহত্তম ঐতিহ্যে প্রশিক্ষিত একটি পার্টি, যে বিপ্লবের স্বার্থে স্বার্থশূন্য আত্মত্যাগের মাধ্যমে জনগণকে অনুপ্রেরণা জোগায় এবং সমস্ত ধরনের বিচ্যুতির বিরোধিতায় অবিচল থাকে – একমাত্র এরকম পার্টিই পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে পারে, বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্রগামী বাহিনীতে পরিণত হতে পারে।''

দশম পার্টি কংগ্রেস স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। এবং এই সংগ্রামে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকেই সামনের সারিতে থাকতে হবে। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ''আমাদের পার্টিকেই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।''

আমি নিশ্চিত যে সংগঠনের সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে আপনারা পার্টির বর্ধিত সম্মান ও প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন। শত শত লড়াকু কর্মী গণসংগ্রাম ও নির্বাচনী সংগ্রামের গর্বে পার্টিতে সমবেত হওয়ায় পার্টিকে সংহত, সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমার আশা, প্লেনামের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছিত ভূমিকা পালনে পার্টিকে সাহায্য করবে।

আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করছি, দশম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব যে দায়িত্ব দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে পার্টি তা একমুহূর্তের জন্য ভুলবে না। যে প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ''জনগণকে শিক্ষিত করতে এবং পরিচালিত করতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা এক শক্তিশালী হাতিয়ার। যে মন্ত্রিসভা আমাদের নেতৃত্বে বামপন্থী দলগুলির জোটের প্রতিনিধিত্ব করছে।''

আমরা সচেতন যে সরকার পরিচালনাকারী পার্টি হিসেবে অবাঞ্ছিত প্রবণতা, সুবিধাবাদী, স্বার্থপরদের সম্পর্কে আমাদের সদাসতর্ক থাকতে হবে এবং পার্টির শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এটা করতে গেলে পার্টির কাজকর্মের সাংগঠনিক নীতি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন। যাতে করে কর্তব্য প্রতিপালনে সমগ্র পার্টিকে যুক্ত করা যায়।

আমরা জানি যে, শত্রুরা সব সময়ই পার্টির মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির বীজ পুঁততে চাইছে, আমাদের বক্তব্য বিকৃত করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের খাটো করতে চাইছে। কিন্তু সমগ্র পার্টিকে একত্রে সচেতন ভাবে এসব প্রতিহত করতে হবে এবং জনগণের সম্পর্ককে সুগভীর ও প্রসারিত করতে হবে।

কমরেডস্, বন্যার দরন এমন সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে যা আমরা আগে ভাবিনি। কিন্তু এবিশ্বাস আছে যে জনগণের সহযোগিতায় এবং পঞ্চায়েতগুলির সাহায্যে পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণের কাজ আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবো। পশ্চিমবঙ্গ পার্টির তরফে আবার আমি আন্তরিকভাবে বৈপ্লবিক শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী দীর্ঘজীবী হোক।

[হাওড়ার সালকিয়ায় ১৯৭৮ সালের ২৭-৩১শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-র কেন্দ্রীয় প্লেনাম উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ২৭শে ডিসেম্বর এই ভাষণ দিয়েছিলেন প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গত, এর আগে ১৯৭৮ সালের ২-৮ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জলন্ধরে সি পি আই (এম) দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সালকিয়া প্লেনামের ঠিক আগেই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর জুড়ে শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম বন্যা মোকাবিলা করতে হয় পশ্চিমবঙ্গকে। প্রমোদ দাশগুপ্ত তখন সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক। দিল্লিতে ক্ষমতাসীন মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা পার্টির সরকার।]

সালকিয়া প্লেনামে গণসঙ্গীত পরিবেশন করছেন গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা

গভীর রাতেও জি টি রোডে লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে পাহারায় পার্টিকর্মীরা

রাহুল মজুমদার

ছোট্ট স্কুল তখন। সবে স্কুল বিল্ডিং দু'তলা হয়েছে কি হয়নি। সালকিয়ার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলের গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের অভাবী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার এই অনামী স্কুলই সেই ক'টাদিন সি পি আই (এম) সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আবাসস্থল। পি সুন্দরাইয়া, ই কে নায়নার, বি টি রণদিভে প্রমুখ পলিট ব্যুরো সদস্যরা তো বটেই, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরাও তখন রাত্রিবাস করেছেন সালকিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলে। চড়া শীতের রাতে বিদ্যাপীঠ স্কুলের ক্লাসরুমের মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে নেওয়া, তো সালকিয়া হিন্দু স্কুলের ক্লাসরুমে বেঞ্চির ওপরেই পাত-পেড়ে খাওয়া-দাওয়া।

সেদিনের লালঝান্ডার সর্বভারতীয় যোদ্ধাদের সাদামাটা জীবনযাত্রার চালচিত্রও ফুটে উঠেছিল পাঁচটা দিনের প্লেনাম-নামায়। তারসঙ্গেই ছিল মজাদার হরেক ছোট্ট ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা। যেগুলি স্মৃতির পাতা থেকে আউড়ে ভাঙা ভাঙা পটে তুলে ধরলেন সেদিনের তরুণ, আজকের বর্ষীয়ান পার্টিকর্মী সংগঠকরা।

প্লেনাম সালকিয়ারই হিন্দি স্কুলে শামিয়ানা খাটালেও সালকিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুল, শিল্পাশ্রম স্কুলেও কিছু প্রতিনিধিদের থাকার জায়গা হয়েছিল। বিদ্যাপীঠ স্কুলে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বে থাকা উত্তর হাওড়ার তৎকালীন পার্টি সংগঠক সজল ব্যানার্জি বলছিলেন পার্টি নেতৃত্বের নিয়মিত অভ্যাসের কথা। স্কুলবাড়িতেই রাত কাটানো পার্টির উচ্চতর স্তরের নেতৃত্ব প্রত্যেকেই একেবারে কাকভোরে উঠে পড়তেন। আর তারসঙ্গেই কয়েকজনের ব্যায়ামের অভ্যাসও তাঁর নজরে পড়েছিল। তবে চড়া শীতের মধ্যে প্লেনামে অংশ নেওয়া প্রতিনিধিদের মধ্যে সকালে গরম জলের বেশ চাহিদা ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের ঘন ঘন গরম জল করে সরবরাহ করতে হত প্রতিনিধিদের স্নানের জন্য। ১৯৭৮সালে পার্টির সালকিয়া প্লেনামে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করা সংগঠক সজল ব্যানার্জি অবশ্য এমনই এক পার্টি সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করে তাঁর চাকরি খুইয়েছিলেন। তারও দশ বছর আগে ১৯৬৮সালে পার্টির হাওড়া জেলা সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছিলেন সজল ব্যানার্জি। শৃঙ্খলার সঙ্গে পার্টির দায়িত্ব পালন করার সময়ে তাঁর 'রিলিভার' (অপর একজন পার্টিকর্মী) সঠিক সময়ে আসেননি। ফলে দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাননি সজল ব্যানার্জি। আর তার ফলে তাঁর চাকরি চলে যায়। সেই সময় লিপটন কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন তিনি।

১৯৭৮সালে কিভাবে পার্টি প্লেনামের আগে 'সালকিয়া' নাম বসলো তারও এক কথোপকথন জড়িয়ে রয়েছে অতীতের স্মৃতির পাতায়। এই মুহূর্তে কিছুটা শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই বাড়িতে রয়েছেন পার্টিনেতা স্বদেশ চক্রবর্তী। বিছানায় শুয়ে শুয়েই বললেন, প্রথমে পার্টির প্লেনাম হবে শুনে আমি, শিবপদ সেনগুপ্ত এবং অঞ্জলি ঘোষ এই তিনজনই নরেশ দাশগুপ্তের কাছে গিয়ে বললাম আমাদের 'ইচ্ছা'র কথা। বললাম হাওড়াতে প্লেনাম হলে ভালো হয়। নরেশদা শুনে বললেন, চিত্তকে (চিত্তব্রত মজুমদার) ডাকো। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি। শেষমেশ চিত্তদার সঙ্গে কথা হওয়ার পর নরেশদা ও আমি প্রমোদদাকে বললাম হাওড়াতে প্লেনাম করার কথা। প্রমোদদা চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। শেষে বললেন, হাওড়ার কোথায় হবে? শেষমেশ স্থির হল সালকিয়াতেই হবে পার্টির প্লেনাম। এদিকে প্লেনামের নামের আগে 'সালকিয়া' বসা নিয়ে এই হাওড়াতেই কিছুটা গুঞ্জন হয়েছিল বটে। বিশেষ করে শিবপুর অঞ্চলের পার্টিকর্মীরাই প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন প্লেনামের নামের আগে সালকিয়া বসবে? কেন হাওড়া বসবে না? অবশ্য সে গুঞ্জন খুব বড় মাপের কিছু হয়নি, বরং পরবর্তী সময়ে দেখা গেল শিবপুরের পার্টিকর্মী সংগঠকরা এই এলাকাগত বিচ্ছিন্নতার ভাবনা ছেড়ে গভীর আন্তরিকতা নিয়ে প্লেনামের দায়িত্ব পালনে নেমে পড়লেন। যদিও জলন্ধর পার্টি কংগ্রেসে প্লেনামের স্থল হিসেবে আগেই হাওড়া বলে চিহ্নিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে স্থির হয় সালকিয়ায় হবে প্লেনাম।

পার্টি প্লেনাম সংগঠিত করতে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়েছিল তার সভাপতি পদে ছিলেন জ্যোতি বসু। কার্যকরী সভাপতি ছিলেন নরেশ দাশগুপ্ত। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন চিত্তব্রত মজুমদার এবং স্বদেশ চক্রবর্তী। আর অভ্যর্থনা সমিতির সহসভাপতি পদে ছিলেন সমস্ত জেলার পার্টি সম্পাদকেরা। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন শিবপদ সেনগুপ্ত। পুরানো স্মৃতি হাতড়ে সেদিন প্লেনামের আয়োজকের দায়িত্ব থাকা আজকের বর্ষীয়ান পার্টিনেতৃত্ব বলছিলেন, সালকিয়া হরগঞ্জ বাজারেই একটা ছোট্ট ঘরকে প্লেনাম সংগঠিত করার লক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতির অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হত। প্লেনামের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহেই নিয়ম করে দু-তিন দিন এই অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে আসতেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

তবে সালকিয়া প্লেনামে রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকেই এসেছিল গভীর আন্তরিকতা মাখা কাঁচা আনাজ, চাল, ডাল, নারকেল, ফল, মিষ্টি নানা কিছু। পুরানো স্মৃতি হাতড়ে স্বদেশ চক্রবর্তীই জানালেন, দার্জিলিঙ জেলা থেকে এসেছিল কমলালেবু ও চা। তখন একত্রিত ২৪পরগনা জেলা থেকে এসেছিল মাছ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে আসে সবজি। বর্ধমান, হুগলী জেলা থেকে আসে চাল ও অন্যান্য রান্নার সামগ্রী। নদীয়া জেলা থেকে মিষ্টি পাঠিয়েছিল পার্টিকর্মীরা। ডেয়ারি থেকে দুধ আর ডিম এসেছিল। মিষ্টি এসেছিল বর্ধমান জেলা থেকেও।

সেইসময়ে প্লেনামের মঞ্চসজ্জা, অলঙ্করণের দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী বিজন চৌধুরি, হাওড়ারই পার্টি সংগঠক শান্তিব্রত মজুমদার, এলাকার চিত্রশিল্পী অজয় দাস প্রমুখ। সালকিয়ারই ত্রিপুরা রায় লেনের একটি নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে এই পার্টি সংগঠক ও চিত্রশিল্পীরা দিন-রাত এক করে বড় বড় তৈলচিত্রের ছবি করেছেন। সালকিয়া হিন্দি স্কুলের পুরানো বিল্ডিংয়ের ঘেরা মাঠেই প্লেনামের মঞ্চ ও প্রতিনিধিস্থল হয়। ঐ জায়গায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সির একটি বইয়ের স্টলও সবসময়ই ছিল জমজমাট। জি টি রোডের ধারে সম্মেলন পার্কে তোরণ হয় বিশাল মাপের। সেখানেই প্লেনামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং পতাকা উত্তোলন হয়েছিল। এই সম্মেলন পার্ক থেকেই প্রতিনিধি ও পার্টিকর্মীরা মিছিল করে প্লেনাম-স্থলে আসেন। সম্মেলন পার্কে কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ ইতিহাস নিয়েই একটি নজরকাড়া প্রদর্শনী হয়েছিল। আর বাবুডাঙ্গার জটাধারী পার্কে হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। সেখানেই শান্তিগোপাল অভিনীত 'স্পার্টাকাস' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। আর এত মানুষ এসেছিলেন যে সেই ভিড়ের চাপে একজন প্রবীণ মারা যান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে।

সালকিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলের পাশাপাশি শিল্পাশ্রম স্কুলেও প্লেনামের কিছু প্রতিনিধির থাকার জায়গা হয়েছিল। তামিলনাড়ু, কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রতিনিধির থাকার জায়গা ছিল শিল্পাশ্রম স্কুল, তাঁদের মধ্যেই থাকতেন আবদুল্লা রসুল। প্লেনামের প্রতিটা দিন নিয়ম করে এই শিল্পাশ্রম স্কুলে সাংবাদিক বৈঠক করতেন ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ।

খাবারের মেনুতেও সাধ্যমতো পরিবর্তন আনা হয়েছিল দেশের নানা প্রদেশের পছন্দ মিলিয়ে। উত্তর ভারতের খাবার, দক্ষিণ ভারতের খাবার, পূর্ব ভারতের খাবার এইরকমই ফারাক কিছু ছিল প্লেনামের প্রতিনিধিদের আপ্যায়নে। তবে দক্ষিণ ভারতীয়দের জন্যই নাকি বিস্তর নারকেল আনা হয়েছিল। আর প্লেনামে কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশের প্রতিনিধিরা মাছ খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন। তবে প্লেনাম চলাকালীনই ছোট ছোট মজার ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে এই খাবার ঘরে। স্বেচ্ছাসেবকেরা পর্যাপ্ত দায়িত্ববোধ নিয়ে খাবার ঘরে কাজ করে চললেও অভিযোগ এলো পয়লা দিনেই। কেরালাসহ দক্ষিণ ভারতের বড় অংশের প্রতিনিধিরা খাবারে স্বাদ পাচ্ছেন না অভিযোগ উঠলো। কিচেনের দায়িত্বে তখন অজিত চ্যাটার্জি ও কালী পাইন। তাঁরা বিশেষ কী সমস্যা তা ভালো করে বুঝে উঠতে পারছেন না। শেষে চিত্তব্রত মজুমদারের কথায় স্বদেশ চক্রবর্তী কেরালার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানলেন খাবার হচ্ছে কিন্তু স্পাইসি (মশলাদার) হচ্ছে না। সমাধানে তড়িঘড়ি হরগঞ্জ বাজার থেকে নিয়ে আসা হল গুঁড়ো লঙ্কার প্যাকেট। আর তাঁদের খাবারে সেসব পড়তেই দক্ষিণী প্রতিনিধিদের মুখে দেখা গেল তৃপ্তির হাসি।

আরেকটি মজার ঘটনা উঠে এলো অশ্রু মুখার্জির কথোপকথন থেকে। খাবার পরিবেশনের দায়িত্বে থেকেই তিনি প্লেনামের প্রতিনিধিদের যখন খাবার দিচ্ছিলেন ঠিক সেইসময়েই ঘটলো একটা ছোট্ট ঘটনা। একদিন সন্ধ্যেবেলা খেতে বসেছেন পার্টিনেতা নৃপেন চক্রবর্তী। কিন্তু আর সকলের মতো নৃপেন চক্রবর্তীর বুকে ব্যাজ দেখা যাচ্ছিল না। আর অশ্রু মুখার্জিও তখন নৃপেন চক্রবর্তীকে চেনেন না। কর্তব্যে অনড় থেকেই ধরলেন গিয়ে তাঁকে। দেখা গেল সেই সময়েই নৃপেন চক্রবর্তীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যিনি সেই পার্টি প্লেনামের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন। মানিক সরকারই তখন অশ্রু মুখার্জিকে জানালেন উনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই কথা বলার ফাঁকে নৃপেন চক্রবর্তী কোর্টের ভেতর থেকে পরা ব্যাজটা বের করে দেখালেন আর স্বেচ্ছাসেবক অশ্রু মুখার্জির কাজের প্রশংসা করলেন হাসতে হাসতেই। উলুবেড়িয়া থেকেই প্লেনামে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলেন সেদিন অশ্রু মুখার্জির সঙ্গে বদরুল আলা, জহুর মিদ্যে, হারাধন বাকুলি প্রমুখ। প্লেনামের কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বললেন, প্রথম প্রথম ভাবলাম খুব অসুবিধায় পড়বো, কেননা স্বেচ্ছাসেবকদেরও তো চিনি না। কিন্তু প্রথম দিনের পরেই ভুল ভাঙলো। দেখলাম এত আন্তরিকতা নিয়ে কর্মীরা কাজ করছেন যেখানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকলেরই নাম-ধাম কেন যেন এক গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমাদের মধ্যে।

স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যেই দায়িত্বে থাকা সৌরেন সরকার জানিয়েছেন সেদিনের কিছু টুকরো টুকরো চালচিত্রের কথা। বললেন, সালকিয়া প্লেনামে পার্টিকর্মীদের কঠোর শৃঙ্খলাও দৃষ্টান্ত ছিল। সম্মেলনস্থলে তো বটেই, ঐ সময়ে শীতের রাতে ১২টায় কিংবা রাত ২টোতেও জি টি রোডের ওপর লালঝান্ডা হাতে সি পি আই (এম) কর্মীদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। এলাকার মানুষই এই দৃষ্টান্ত নিয়ে মনে মনে তারিফ করেছেন সি পি আই (এম)-র কঠোর শৃঙ্খলার। সৌরেন সরকার বলছিলেন এলাকার কংগ্রেসী পরিবারের সদস্যরাও এই দিকটি তুলে ধরে প্রকাশ্যে তারিফ করেছেন পার্টির। আরও একটি বিষয়ে সেইসময়ে এলাকার অনেক মানুষ তাঁকে বলেছিলেন। তা হলো প্লেনামের উদ্বোধনে একটি গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছিল যে গান বেশ ভালো হয়েছে বলে কংগ্রেসীরাই বলেছেন। কাকদ্বীপের অহল্যা মা'কে নিয়ে সলিল চৌধুরির সেই গানটি পরিবেশনা করেছিলেন তৎকালীন গণনাট্য সংঘের কর্মী এবং প্লেনামের স্বেচ্ছাসেবক বাসন্তী মজুমদার। সালকিয়া পার্টি প্লেনামে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছিলেন আড়াইশো জন পার্টিকর্মী। স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় থাকা এই আড়াইশো জনের মধ্যে ৫০জন ছিলেন মহিলা ভলান্টিয়ার। গভীর আন্তরিকতা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা কেউ খাওয়ার জায়গায়, কেউ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে, প্রদর্শনীস্থলে, কেউবা সম্মেলনস্থলে শৃঙ্খলার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বি জে পি ও তৃণমূল উভয়েই মানুষের ঐক্যের শত্রু

মহম্মদ সেলিম

কমিউনিস্ট পার্টির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্লেনাম। দীর্ঘ ৩৭বছর পর আবার এই বাংলাতেই সি পি আই (এম)-র' প্লেনাম হচ্ছে। এমন একটা সময়ে এই প্লেনাম হচ্ছে, যখন এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং গোটা দেশের পার্টি। প্রতিকূল এক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে কিভাবে আমরা সুসংগঠিতভাবে পার্টিকে গড়ে তুলবো সেটা এই প্লেনামে মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন স্তরে আমরা যারা সংগঠন পরিচালনা করছি, বিভিন্ন অংশের মানুষের আন্দোলনকে সূত্রায়িত করছি তারা আগামীদিনে কোন পথে সংগঠনকে দৃঢ় করবো এবং কোন পন্থায় গণসংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, তা যেমন আমাদের নির্ণয় করতে হবে পাশাপাশি পার্টির কর্মসূচি বৃহত্তর জনসমাজের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যও এই প্লেনাম। যাবতীয় আক্রমণকে মোকাবিলা করেই আগামীদিনে পার্টি বিভিন্ন বাঁক ও মোড়ে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলবে –এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে আমরা একত্রিত হচ্ছি প্লেনামের মঞ্চে। এদেশের ব্যাপকতর মানুষের যা প্রয়োজন – স্পষ্টত উচ্চারিত দাবি, রোজকার যে চাহিদা এবং জ্বলন্ত সমস্যা, আন্দোলন সংগ্রামে সেগুলিকে মূর্ত করে তা আদায়ের লক্ষ্যে এগোনোই আজ মেহনতি মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

১৯৭৮-র সালকিয়া পার্টি প্লেনামের পরে ৩৭ বছরে গোটা বিশ্বেই এবং তারসঙ্গে আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, আমাদের অর্থনীতি এবং মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা, জীবনচর্চা, জীবন জীবিকা-সহ আনুষঙ্গিক সবক্ষেত্রেই বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক সংগঠন তাই এই পরিবর্তনগুলোকে বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করে এবং তাকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সূত্রবদ্ধ করে আগামীদিনে লড়াই সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে আবশ্যিক সাংগঠনিক কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে। সময়োপযোগী শক্তিশালী গণভিত্তি-সম্পন্ন বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ সতেজ সংগঠন ও গতিশীল সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়ণ আজ খুবই জরুরি।

নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে গোটা দেশে উদারীকরণের পথ ধরে অর্থনীতি যে দক্ষিণ পথে বাঁক নিয়েছিল সেই দক্ষিণ পথেই আজকে দেশের রাজনীতিও ঝুঁকে পড়েছে। রাজনৈতিক অর্থনীতির দক্ষিণপন্থী এই বাড়বাড়ন্তকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সমাজ, দর্শন, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, শিক্ষা ও মানবিক দৃষ্টিকোণকে চরম দক্ষিণ অভিমুখে ধাবিত করার অপচেষ্টা চলছে প্রতিনিয়ত। কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এর মোকাবিলা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। দেশপ্রেমিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষকে এর বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা ও সংঘবদ্ধ প্রয়াস গড়ে তোলার দায় কমিউনিস্ট পার্টি কোনদিন অস্বীকার করে না। তাই মানুষের দৈনন্দিন যে অভাব-অভিযোগ-চাহিদা তা মেটানোর দাবিতে সমস্ত বামপন্থী শক্তিকে একজোট করে আন্দোলনের ভিত্তিতে জনগণের বৃহত্তর অংশকে শামিল করতে হবে।আর তার মধ্যে দিয়েই সমস্যা জর্জরিত সমাজকে বদলের লক্ষ্যে এগিয়ে চলাই আমাদের কাজ। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা বেকারি, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্র্য, উপযুক্ত শিক্ষা-চিকিৎসা-আবাসের অভাব, মুনাফাভিত্তিক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কখনই দূর করতে পারে না। শাসকেরা এই জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে আবেগভিত্তিক ধর্মীয় উন্মাদনা, জাতিবিদ্বেষ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার সুপ্ত দানবীয় শক্তিকে খুঁচিয়ে তুলছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের একটা অংশের বিরুদ্ধে আরেকটা অংশের অনবরত সংঘর্ষ, বিভেদ লাগিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে চলেছে।

এই কাজে তাদের সাফল্যের প্রথম শর্তই হচ্ছে বামপন্থাকে দুর্বল করা। কেননা আদর্শগতভাবে কমিউনিস্টরা, বামপন্থীরাই একমাত্র এই প্রতিক্রিয়ার শক্তির মোকাবিলায় সক্ষম। তাই দেশে দেশে এমনকি আমাদের দেশেও শাসকের প্রথম কাজ কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বল করা। এই প্রেক্ষাপটে বামপন্থী আন্দোলনে যেহেতু আমাদের রাজ্য অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত, তাই বিগত কয়েকবছর ধরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আক্রমণ নামিয়ে আনছে কমিউনিস্টদের ওপর, বামপন্থীদের ওপর।

আমাদের বহু কমরেড ঘরছাড়া, বিনা অপরাধেই মিথ্যা মামলায় জর্জরিত, কারাগারের অন্তরালে অত্যাচার যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছেন, ঘরছাড়া পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, উপার্জনকারী মানুষ কর্মচ্যুত। আক্রান্ত এই সময়েই বহু পার্টিকর্মী লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড়িয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। তারইসঙ্গে সামগ্রিকভাবে গোটা রাজ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে একটা ভয় ও সন্ত্রাসের বাতাবরণ। যার মূল লক্ষ্য সি পি আই (এম) তথা বামপন্থীদের গণভিত্তিকে দুর্বল করা, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে গভীর ও নিবিড় নেটওয়ার্ক তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে শাসকদলের নেতানেত্রীদের ভাষণের মধ্যেই হদিশ পাওয়া যায় এই আক্রান্ত সময়ের। ''বুকে পিঠে পোস্টার লাগিয়ে বলতে হবে আমি বামপন্থী রাজনীতি করি না।'' ''মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখুন''। ''দূরবীন দিয়েও কোথাও সন্ত্রাস খুঁজে না পাওয়া'' –এই ধরনের দাম্ভিক ঘোষণা আদতে সুপরিকল্পিতভাবে সরকার, প্রশাসন, এবং তার শাসকদলের জল্লাদবাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগিয়েই এই সন্ত্রাস নামিয়ে আনারই প্রয়াস। শুধু বামপন্থীরা নয়, এই সন্ত্রাসে বিদ্ধ হচ্ছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। সমাজের দুর্বলতর ও পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ এই সময়ে আক্রান্ত হয়েছেন ভয়ানকভাবে। আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, তফসিলি জাতি, অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, মহিলা সমাজ, ভাগচাষী, অভাবী গরিব কৃষক, খেতমজুর, দিনমজুর, হকার, চা-শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিচালক, অটোচালক, রিকশাচালক –প্রায় সমস্ত প্রান্তিক অংশের মানুষই আজ এই চড়া আক্রমণের শিকার। তাদের জীবন-জীবিকা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে প্রতিটা মুহূর্ত।

গত কয়েক বছরে আমাদের পার্টির প্রথম দায়িত্ব ছিল এই সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়েও, এই আক্রমণকে মোকাবিলা করে পার্টির যে সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে তাকে আগলে রাখা। আর তারসঙ্গেই সংগঠিত করা মানুষের রুটিরুজির আন্দোলন সংগ্রাম। পার্টিকর্মী, দরদী, সমর্থক, এবং গণসংগঠনে শামিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশকে তাঁদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে অকুতোভয়ে পথে নামানো আমাদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ। শাসকদলের এই সন্ত্রাস ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকুচিত করার অপচেষ্টা শুধুমাত্র বামপন্থী আন্দোলনকে শেষ করতেই উদ্যত ছিল না। বামপন্থাকে মানুষের কাছে ভিলেন (খলনায়ক) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাও ছিল এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অন্যতম কাজ। বামপন্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর নানা ষড়যন্ত্রও চালানো হয়েছে এই সময়ে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই প্রত্যাঘাতের চ্যালেঞ্জ নিয়েছি আমরা। শুধু কমিউনিস্ট নয়, বামপন্থী মনোভাবাপন্ন রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দল, সংগঠন, গোষ্ঠি এমনকি ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গকে সন্ত্রাসমুক্ত করা, রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা, ক্রমাগত সংকুচিত গণতান্ত্রিক পরিসরকে আরও প্রসারিত করা এবং স্তব্ধ হয়ে যাওয়া রাজ্যের উন্নয়নকে ফিরিয়ে আনার কাজে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষ্যেই আগামী ২৭শে ব্রিগেড।

কেন্দ্রে এবং রাজ্যের শাসকদল পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট ছক কষে ধর্মভিত্তিক বিভাজনের ও বিদ্বেষের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে উসকে দিচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে শাসকের এটাই শেষ চাল। কারণ লালঝান্ডার শক্তি যে প্রকৃতই জাতি, ভাষা, ধর্ম, জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে মানুষের ঐক্য তা এই শত্রুরা চেনে। আর তাই সেই ঐক্যকেই ওরা টার্গেট করেছে, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে। বিজেপি তৃণমূলের নিজস্ব কোনও ঝগড়া নেই। নীতিগত ঝগড়া তো নেই-ই, ভাগ বাটোয়ারার প্রশ্নেও নেই, এমনকি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নেতা-নেত্রীদের বাঁচানোর প্রশ্নেও নেই। বরং গত কয়েকমাসে এই পুনরুজ্জীবিত বাম শক্তিকে দেখে মোদীভাই-দিদিভাই এ মাসের গোড়ায় দিল্লিতে বসে নতুন করে ছক কষেছেন। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী ও তার শাগরেদদের দিয়ে ধর্মভিত্তিক প্রতীক, পরিচিতি, ও প্রতিনিধিদের জড়ো করে তৎপরতা বাড়িয়ে অপরদিকে 'মুসলিম তোষণ'এর ধুয়ো তুলে মুসলিম বিদ্বেষের রাজনীতিতে ইন্ধন জোগানো যায়, সেই অভিযন্ধিই চলছে। যাতে সংঘ পরিবার দ্বারা সংখ্যাগুরু ধর্মীয় প্রতীক আবেগ, পরিচিতি ও ধর্মীয় সংগঠনকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে গভীরতর করা যায়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট থেকে আসাম পর্যন্ত এ জাতীয় রাজনীতির ভয়ংকর পরিণতি আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি।

আদতে এটা তৃণমূল-বিজেপি'র মধ্যেকার লড়াই নয়। হিন্দু-মুসলমানের লড়াইও নয়। বরং এটা বিজেপি-তৃণমূলের যৌথ অভিযান। লক্ষ্য এরাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে নষ্ট করা। কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের কোনও যুদ্ধ নেই। আর বলাবাহুল্য কেন্দ্রেরও কোনও যুদ্ধ নেই রাজ্যের বিরুদ্ধে। উভয়ে মিলে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে, উন্নয়নের বিরুদ্ধে, শান্তি ও সম্প্রীতির বিরুদ্ধে। তাই আমাদেরও শপথ নিতে হবে। মানুষের দাবি আদায়ের আসল যুদ্ধের ময়দানে বিজেপি ও তৃণমূল উভয়েই মানুষের ঐক্যের শত্রু। রাজ্যের সম্প্রীতির শত্রু বিজেপি এবং রাজ্যের উন্নয়নের শত্রু তৃণমূল কংগ্রেস উভয়ের এই মিলিত অভিযানকে রোখার শপথ নিয়েই ২৭শে ব্রিগেডে লাখো মানুষ শামিল হবেন। প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েই শত নির্যাতন, অত্যাচারকে উপেক্ষা করে লাল পতাকা আজও বাংলার মাটিতে উড্ডীন।

ব্রিগেডে লাখো মানুষের মুষ্টিবদ্ধ হাত ২৭শে ডিসেম্বর সেই শপথ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যাতে আগামীবছর ২০১৬-তে রাজ্যের হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে আমরা পারি, এই বাংলার উন্নয়নের অবরুদ্ধ পথকে প্রশস্ত করতে পারে। অসংখ্য বেকার, তরুণ তরুণী কর্মসংস্থানের অধিকার পেতে পারেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকে দূর করে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যায়। নারী নির্যাতনকারী শক্তিকে চিহ্নিত করে মহিলাদের নিরাপত্তা ও মান-সম্মান সুনিশ্চিত করা যায়। সংখ্যালঘুদের অধিকার, আদিবাসী তফসিলি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষদের মর্যাদার সঙ্গে জীবন-জীবিকার সুযোগ, তাঁদের ভাষা সংস্কৃতির অধিকারকে সুরক্ষিত করা যায়, গ্রাম-শহরের গরিব মানুষের জীবনের মানকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কৃষি ও কৃষকের সংকটকে দূর করে তার ফসলের দাম সুনিশ্চিত করা, কৃষকের আত্মহত্যা ও চা-বাগানের শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যুর মিছিলকে স্তব্ধ করা। নবপর্যায়ে শিল্প কল-কারখানা গড়ে তোলা। একাজে রাজ্যের সমস্ত মানুষ শুধু নয়, যাঁরা সারা দেশে এবং দেশের বাইরে এই বাংলার শুভানুধ্যায়ী মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন তাঁদের কাছেও আজ বাংলাকে বাঁচানোর আহ্বান জানানোর জন্য সন্ত্রাসের চোখ-রাঙানিকে উপেক্ষা করে হক কথা সোচ্চারে বলবার দিন ২৭শে ব্রিগেড।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র

তিনটি প্লেনাম-তিনটিই পশ্চিমবঙ্গে

মদন ঘোষ

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৬৪ সালে সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে গড়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি –-ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। ত্রুটি ও দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের আস্থাভাজন হয়ে ওঠার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের পার্টি। গত কিছুদিন যাবৎ, বিশেষত বিগত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে আমাদের জনসমর্থন হ্রাসের পিছনে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কারণগুলি চিহ্নিত করা এবং সেগুলি কাটিয়ে উঠে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আগামী ২৭-৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৫ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পার্টির দ্বিতীয় সাংগঠনিক প্লেনাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে পার্টি সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রথম সাংগঠনিক প্লেনামটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালের ২৭-৩১শে ডিসেম্বর, হাওড়া জেলার সালকিয়ায়।

পার্টির মতাদর্শগত অবস্থান

সপ্তম কংগ্রেসের সময় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে, প্রধানত সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ এবং যার প্রভাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তার মর্মবস্তু অনুধাবন করে কোনো একটি পার্টির যুক্তিতে প্রভাবিত না হয়ে পার্টির স্বাধীন অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল সপ্তম কংগ্রেস। ঐ কংগ্রেসে পার্টি কর্মসূচি ও কর্মনীতি গৃহীত হলেও মতাদর্শগত অবস্থান চূড়ান্ত করা হয়নি। সপ্তম কংগ্রেস নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে মতাদর্শগত বিতর্ক চলছিল সে নিয়ে পার্টির মধ্যে আন্তঃপার্টি খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন অবস্থানে পৌঁছানোর উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু পার্টি কংগ্রেসের পর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ভারত সুরক্ষা আইন (ডি আই আর)-এর মাধ্যমে সমগ্র পার্টির ওপর যে দমন-পীড়ন চালাচ্ছিল এবং দেশব্যাপী গণসংগ্রাম পরিচালনায় ব্যস্ত থাকা ও কমিউনিস্ট বন্দিদের মুক্ত হওয়ার পর চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির কারণে সে নির্দেশ পালন করতে পারেনি। সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিল। তারই ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালের ৫-১২ই এপ্রিল প্রথম প্লেনামটি অনুষ্ঠিত হয় জেলা শহর বর্ধমানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৯০ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর দুনিয়ায় শ্রেণিশক্তির ভারসাম্য ঢলে পড়ে সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে। মতাদর্শগত আক্রমণ শুরু হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল নীতিগুলির ওপর। বিশ্বের দেশে দেশে, বিশেষত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি তুলে দেওয়া, নাম পালটানো ও নীতি পরিবর্তন শুরু হয়। শুরু হয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি। আমাদের দেশেও এই কাজ শুরু হয়। বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় কমরেড ও দরদিদের মধ্যে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন অনুভূত হয় পার্টির মতাদর্শগত অবস্থান নতুন করে ব্যক্ত করার। ১৯৯২ সালের ২-৯ই জানুয়ারি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে 'কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয়ে' (On Certain Ideological Issues) দলিলটি গৃহীত হয়।

কলকাতা প্লেনাম বা দ্বিতীয় সাংগঠনিক প্লেনাম

সালকিয়া প্লেনাম এমন একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংগ্রাম আন্দোলনের ফলে জনসমর্থন ছিল ঊর্ধ্বমুখী। পার্টি ও গণফ্রন্টগুলির শক্তি বাড়ছিল। পার্টি বিকশিত হচ্ছিল। সালকিয়া প্লেনাম থেকে পার্টি কর্মসূচির রণনীতিগত লক্ষ্য অর্জনের পথে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার লক্ষ্যে পার্টির শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াসে বলা হয়েছিল ভারতের বিপুল আয়তন ও বিশাল জনসংখ্যা এবং একটি লেনিনবাদী পার্টির গুণগত মানের বিচারে আমাদের পার্টি একটি দুর্বল পার্টি। দুর্বল এলাকাগতভাবে, সংখ্যাগতভাবে ও গুণগতভাবে। এই দুর্বলতা দ্রুত কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে বিপ্লবী গণপার্টি গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

বিপরীতে কলকাতা প্লেনাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন পার্টি ও গণফ্রন্টগুলির শক্তি হ্রাসমান। ১৯৭৮ সালের পরবর্তী ৩৭বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। আর্থিক ক্ষেত্রে বেড়েছে বৈষম্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে জাত-পাত, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিভেদ কমেনি। (১) ২০১৪ সালে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে কর্পোরেট পুঁজি, কর্পোরেট মিডিয়া ও সাম্প্রদায়িকতা যৌথ প্রয়াসে বি জে পি তথা সংঘপরিবারের বিজয়ের মধ্য দিয়ে দেশজোড়া শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের ঐক্যের ক্ষেত্রে এক বড় বিপদ সৃষ্টি হয়েছে। বিপদ সৃষ্টি হয়েছে একনায়কত্বের। (২) ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর উদারীকরণের ফলে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র ছাড়া গ্রাম শহরের শ্রমজীবী অংশের জীবনে ও মানসিকতায় কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা বোঝার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। তার মূল্যায়নের ভিত্তিতে কোনো ধরনের নতুন স্লোগানকে সামনে রেখে তাদের আকর্ষিত করে আন্দোলনে শামিল করা যায় এবং তারজন্য কাজের ধরনে কি পরিবর্তন আনা দরকার তার ভিত্তিতে শ্রেণি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায় তাও আলোচিত হবে প্লেনামে। (৩) শুধুমাত্র অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেই নয়, এই সময়কালে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। বাড়ছে চুক্তিভিত্তিক, ঠিকা ও দৈনিক মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা। বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। কাজ হারানোর ভয়ে এরা ভীত। এদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। (৪) নয়া উদারনীতির ফলে একদিকে জমি হারানোর গতি বাড়ছে। অন্যদিকে কৃষক সমাজের মধ্যে বাড়ছে স্তরভেদ। সরকারি কৃষিনীতির সুযোগ সুবিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে ও কৃষি ভিন্ন অন্য আয়কে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে একটা নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। নতুন শোষক হিসেবে গ্রামাঞ্চলে এরাই শাসকশ্রেণিগুলির শক্তির উৎস। এদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ শ্রমজীবী অংশসহ কৃষক সমাজের ব্যাপক অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। (৫) পার্টির বিপ্লবী সত্তাকে বজায় রেখে, পার্টি কমরেডদের মতাদর্শগত মানকে আরও উন্নত করে জনগণের চিন্তা চেতনার মোড়ক ঘোরানোর লক্ষ্যে কিভাবে কাজ করা যায় – গণলাইন নেওয়া যায় সেটাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্লেনামের আলোচনায়। (৬) শ্রমজীবী অংশ থেকে নবীন কর্মী তুলে আনা ও তাদের সংগঠক হিসাবে গড়ে তোলার কাজের ওপর নির্ভর করছে সংগঠনের ভবিষ্যৎ। তাই সেদিকটিও উঠে আসবে আলোচনায়। (৭) আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে পার্টিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লেনিনীয় নীতির প্রয়োগ অসম্ভব। অসম্ভব আমলাতান্ত্রিকতা বা ঐ ধরনের প্রয়োগ বিচ্যুতি থেকে পার্টিকে রক্ষা করা। প্লেনামে এই নিয়েও আলোচনা হবে। (৮) কমিউনিস্ট আন্দোলনে সর্বক্ষণের কর্মীর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শ্রমজীবী ও সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে নবীন ও ত্যাগের মানসিকতা সম্পন্ন সংগঠক কর্মীদের চিহ্নিত করে তাদের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে তুলে আনতে হবে। তাদের মতাদর্শগত ও চলতি রাজনৈতিক রাজনীতি সম্পর্কে শিক্ষিত করে সংগঠনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ছাত্র-যুব অংশ থেকে সর্বক্ষণের কর্মী তুলে আনার দিকে। (৯) পার্টি ও গণফ্রন্টের সম্পর্কের বিষয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনও ধারণার অস্বচ্ছতা থেকে গেছে। পার্টিকর্মীদের মধ্যে এসম্পর্কে ধারণার স্বচ্ছতা আনার সাথে সাথে গণফ্রন্টগুলিকে স্বাধীন সত্তা নিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। (১০) আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ অংশগুলি এখনও সামাজিক নিপীড়নের শিকার। তাই সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার সাথে সাথে অন্যান্য সামাজিক ইস্যু নিয়ে সংগ্রামের বিষয়টিও আলোচনায় প্রাধান্য পাবে। (১১) নব্য উদারনীতির ফলে দেশে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে। এক্ষেত্রে ঐসব এলাকার শ্রমজীবী মানুষেরা ক্রমশ প্রান্তিক অধিবাসীতে পরিণত হচ্ছেন। বঞ্চিত হচ্ছেন নগর জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তো দূরের কথা, বঞ্চিত হচ্ছেন কায়ক্লেশে বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও। তাই এই অংশের মধ্যে কাজে গুরুত্ব দিতে হবে।

স্বাধীন শক্তির বিকাশ

রণনীতিগত লক্ষ্য অর্জনের পথে পার্টি বর্তমান পর্যায়ে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে চায়। একাজ করতে গেলে পার্টির স্বাধীন শক্তির বিকাশ দরকার। পার্টির একবিংশতিতম সম্মেলনের রিপোর্ট অনুসারে আমাদের যে বিপুল সম্পদ আছে তাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে হবে। কমরেডদের মতাদর্শগত চেতনার মানকে উন্নত করে গণফ্রন্টের কাজে নিয়োগ করতে হবে। জনসংযোগ বৃদ্ধির কাজে লাগাতে হবে। ত্রুটিমুক্ত করে এই বিপুল সম্পদকে ব্যবহার করতে পারলে আমরা নিশ্চয় ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো।

কলকাতা প্লেনাম উপলক্ষে পদযাত্রা। ছবি : অচ্যুৎ রায়